Phone : (033) 2970-1513 (Office)
(033) 2407-1828
Mobile : 9432207607

NEW ALIPORE COLLEGE

GOVT. SPONSORED ● NAAC ACCREDITED - GRADE B+ ● ISO Certified (IN12629A)

NEW ALIPORE, KOLKATA-700 053

E-mail : newaliporecollege@yahoo.co.in ● Website : www.newaliporecollege.ac.in

Ref. No. .... Date ....

A college funded project entitled "**The Legacy of South Kolkata and the History of Bhowanipore**" was completed by the Department of History. The project was sponsored by New Alipore College. The project traces the formation of Kolkata from its three constituent villages, Kolkata, Sutanuti and Gobindapur. Bhowanipore is situated in the Southern most point of erstwhile Gobindapur .It grew to become an educational hub with well known educational institutions in the locality. It is also well known for the entertainment industry with noted thespians living here. Stalwarts like Netaji Subhas Chandra Bose and Chittaranjan Das who lead India's freedom struggle lived here. Demographically and religiously diverse, Bhowanipore has thus a rich legacy and history. This project penetrates deep into the history of the region and maps the heritage and sites with illustrations.

Name of the Primary Investigator Dr. Srabani Datta

Co- Investigators – Mrs. Ranjana Mondal & Mr. Utpal Sarkar

02. 02. 2023

Principal
New Alipore College
Block-I, New Alipore
Kolkata - 700 053

সূচনাকাল

সময়ের বহমান স্রোতে বাংলার সমাজ জীবনে বিভিন্ন সময়ে নানা কারনে পরিবর্তন হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দি থেকে ইউরোপীয় বণিকের আগমনে বাংলা সমাজ একটা বড়ো মোড় নিল। পর্তুগীজ ওলন্দাজ ইংরেজ দিনেমার ফরাসি বণিকেরা মূলত ব্যবসার লোভে বাংলায় আস্তে শুরু করে। ব্যবসার জন্য ঘাঁটি গড়ে, কিছু চার্চও তৈরি করে।

জোব চার্নক ব্যবসার উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচন করলেন সুতানুটি গ্রামকে। ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে ১৬ হাজার টাকা দিয়ে ইংরেজরা কিনে নিল কলকাতা সুতানুটি আর গবিন্দপুর বই তিনটি গ্রামকে। দেখতে দেখতে এই তিনটি গ্রামই ব্যবসা বানিজ্যের মূলকেন্দ্র হয়ে উঠল।

১৭৫৭'র পর বাংলার সমাজ জীবনে আবার একটা পরিবর্তন এল। পরাধীনতার বা স্বাধীনতার স্বাদ ও ধারনা তখনও বাংলার বুকে বীজ বপন করেনি। ১৭৭২ সালে সরকারি ভাবে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় চলে এল রাজধানী। সেই সূত্রে আরও প্রসারিত হল ব্যবসা বানিজ্য। ফলে স্থানীয় জেলে, হাঁড়ি-ডোম-কামার-চাষি তাদের জমি থেকে উৎখাত হতে লাগল। সেখানে জাঁকিয়ে বসল ব্যবসাদার, ঠিকাদার, মহাজন, দালাল, মুনসী ও কেরানী সম্প্রদায়ের মানুষজন। নতুন নতুন পথে কাঁচা টাকার আমদানিতে গড়ে উঠল এক নতুন সমাজ । ফলে সূতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুরের বহমান গ্রাম সমাজ ক্রমশ অবলুপ্ত হল। সূচনা হল নগরায়নের।

<u>বন কেটে বসত</u>

আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় উপাদান ক্রম বিকাশিত হচ্ছে নগর তার নিত্য নতুন পরিকল্পনায়। সেই যোগসূত্রে কলকাতার সাথে দক্ষিনের মানচিত্রে অবস্থিত আদিগঙ্গার পূর্বতীরস্থ ভবানীপুরও প্রসারিত হচ্ছে। একদিন যে শহরটি জোব চার্নকেরতত্ত্বাবধানে তিনটি গ্রামকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে সুতানুটি ডিহি কলকাতার সঙ্গে উচ্চারিত হয় গোবিন্দপুর নামক গ্রামটিও। বসতি বিহীন প্রায় জনমানব শুন্য, শ্বাপদ সঙ্কুল অরন্যে রাতের প্রহরে প্রহরে দলবদ্ধ শেয়ালের ডাক। রাতচরা পাখির ডানা-ঝাপটানির মাঝে মধ্যে তাগড়া সম্বরের হঠাৎ গর্জন। কথিত আছে হেস্টিংস সাহেবের না কি খুব মন খারাপ হয়েছিল যখন তার শিকার করা বন্ধ হয়েছিল- কারন ইংরেজদের কেল্লা তৈরির পাশাপাশি গোবিন্দপুরে শুরু হয়েছিল বন কেটে বসতের এক সময়ে আজকের যে চৌরঙ্গী অঞ্চল তাও ছিল গোবিন্দপুরের সিমানার মধ্যে। কলকাতার দুর্গ বা কেল্লা নির্মাণের জন্য এই বনজঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। কারন কিছুদিনের পরেই নির্মিত হবে সাহেবের কলকাতার মানচিত্র। এই মানচিত্র নির্মান সম্পর্কে বাংলা সন ১২৩২ বঙ্গাব্দের ‘সমাচার দর্পণ’ লিখেছে-

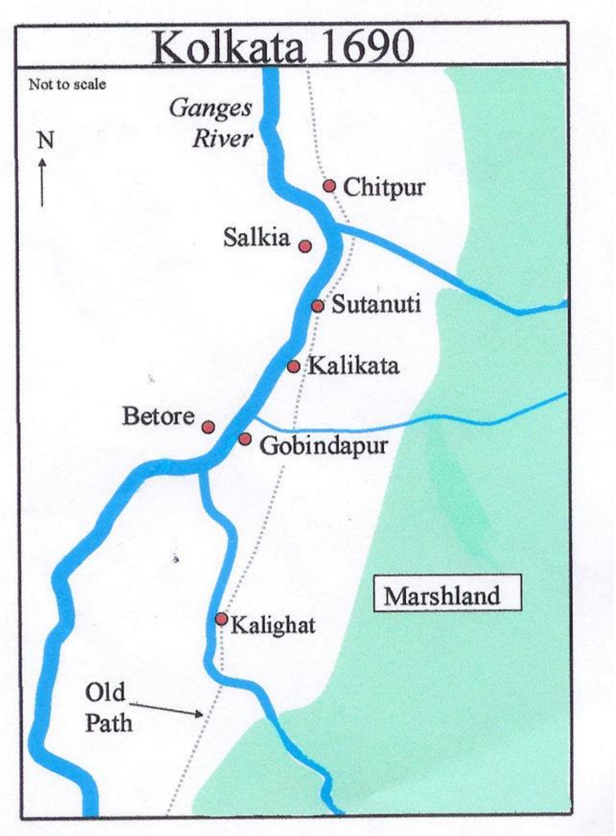

কলকাতার নকশা

<u>ইতিহাস ফিরে দেখা</u>

বাঙালীদের প্রিয় শহর , কলকাতা, অতীতের শহর কলকাতার, স্বপ্নের শহর কলকাতা, আম বাঙালীর হৃদপিন্ড হল কলকাতা। কলিকাতাকে জানতে হলে বুঝতে হলে, উওলব্ধি করতে হলে, আমাদের পিছন ফিরে তাকাতে হবে,সেই সুদূর অতীতকালের দিকে। ‘পীঠমালা’ নামক সংস্কৃতকাব্যে সতীর একান্ন পীঠের কথা বর্ণিত আছে। কালীঘাত অন্যতম পীঠস্থান, সেখানে এসে পড়েছে দেবীর দক্ষিনপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি। তাই জনগনের গভীর বিশ্বাস, মূলনাম কলকাতা বা ক্যালকাটা ছিল না, ছিল ‘কালীক্ষেত্র’। কালীক্ষেত্র থেকে এসেছে কালীখেত – কালীকোটা এবং তার অপভ্রংশ ‘ক্যালকাটা’। কোনও কোনও ঐতিহাসিকদের মতে শব্দটি ‘কালীঘাট’ শুব্দের অপভ্রংশ আবার কেউ কেউ মনে করেন শব্দ দুটির মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। বহু খ্যাতনামা লেখক মনে করেন যেঁ কলকাতা মহানগরের দক্ষিনাংশে অবস্থিত দেবী কালীর নাম থেকেই কলকাতা নামটির উৎপত্তি হয়েছে।

কলকাতার উৎপত্তি হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বানিজ্য নগরী হিসাবে। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব আলমগীরের পৌত্র সুলতান আজিম ওসানের বাংলা শাসন সময়ে, ইংরেজরা সূতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয়, সুবাদারের নিকট ষোল হাজার টাকায় ক্রয় করেন। এই গ্রামত্রয়ের জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে নবাব সরকারকে নিয়মিত বাৎসরিক খাজনা দিতে হত।

কেশব রায়ের জমিদারির মধ্যে তিনটি গ্রাম ইংরেজদের হস্তগত হওয়ায় দক্ষিন অঞ্চলের জমিদারি তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধে রায় মহাশয় নানা সুবিধা ভোগ করতে থাকেন। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিলটন নামক একজন ইংরেজ চিকিৎসক দিল্লির সম্রাট ফারুকসিয়ারের পীড়া আরোগ্য করে কলকাতার নিকটবর্তী ৩৭ টি মৌজা ক্রয় করবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইংরেজরা এই জমি লাভের সনদ পেলে, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ প্রচন্ডভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং কলকাতার কাছে পরগনার জমিদাররা অর্থাৎ যাঁরা রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী ছিলেন তাঁদের গোপনে নিষেধ করে দেন ইংরেজ কোম্পানিতে জমি বিক্রয় করতে।এই সময় কেশব রায় দেখলেন, নিজের জমিদারির কেন্দ্রস্থলে না থাকলে জমিদারি শাসনও অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই জন্য তিনি নিমতা বিরাটী ত্যাগ করে কালীঘাটের প্রায় তিনক্রোশ দক্ষিন পশ্চিম ভাগীরথীর অপর পাড়ে বড়িশাগ্রামে এসে বাস করলেন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে সাবর্ন রায় চৌধুরী জমিদারদের বড়িশায় বাস আরম্ভ হয়েছে। তখনকার মানচিত্র জানান দেয় – পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে সুতানুটি, পূর্বে লোনামাটির জলাভূমি, দক্ষিনে গোবিন্দপুর ডিহি কলকাতার এই ছিল চতুঃসীমা।

বাগবাজারের খাল থেকে বড়বাজারের টাঁকশাল পর্যন্ত কলকাতা আর কলকাতার দক্ষিনে আজকের ভবানীপুর পর্যন্ত গোবিন্দপুর। এই তিনটি গাঁয়ের ভিতর দিয়ে ছিল দুটি খাল, একটা চৌরঙ্গীর

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কালীঘাট আর দ্বিতীয়টি ক্রিক রো দিয়ে সোজা ধাপা। ধাপা খালের নামই ছিল সল্টলেক।

চৌরঙ্গীর নাম নিয়ে যেমন নানা গল্প গাথা প্রচলিত আছে, তেমনই গোবিন্দপুরের নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা দ্বন্দ আছে। কথিত আছে রাজা প্রতাপাদিত্যের সময়কালে অর্থাৎ 'বারোভাটির' বাংলার গোবিন্দ দত্ত নামে একজন রাজা গঙ্গাসাগরে তীর্থ যাত্রা সেরে ঘরমুখো চলেছেন নৌকা চালিয়ে। হঠাৎ নদীপথে রাতের বেলায় কালীদেবী স্বপ্নাদেশ দিলেন। কালক্রমে গোবিন্দ দত্ত'র নামানুসারে এই মহাগ্রামটির নাম হল গোবিন্দপুর।

গোবিন্দ দত্ত মাটি খুঁড়ে টাকার পাহাড় পেলেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি মাতৃপুজার আয়োজন করলেন। কালীদেবীর পূজা হোম যাবতীয় শাস্ত্রাচারে অর্চনা করে একটি গ্রামের পত্তন করলেন। গোবিন্দজীর কৃপায় অর্থলাভ সম্ভব হয়েছে মনে করে গ্রামের নামকরন করলেন গোবিন্দপুর।

হুগলীর ফৌজদার মীর নাসিরের দূত একদিন বজরার ছিপ ফেললেন গোবিন্দপুরের ঘাটে। তাঁরা ফোর্ট উইলিয়ামে দেখা করতে এলো গভর্নারের সঙ্গে এবং জানাতে এলো মুর্শিদকুলি খাঁর খবর পেয়েছেন যে ভূষর্নার জমিদার সীতারাম রায়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়স্বজন ত্রিশলক্ষ টাকা নিয়ে আত্মগোপন করেছে সীতারামের ফাঁসির পরবর্তীকালে। হেজেস ডেকে নিলেন কলকাতার জমিদার স্যামুয়েলকে। অনেক অনুসন্ধান করেও খোঁজ মিলল না। অনেক পরে খবর এল সীতারাম রায়ের লোকজন আছে লাট গোবিন্দপুরের পাটয়ারী রমানাথের গৃহে। ব্যক্তিগত সমূহ বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও রমানাথ যশোহরের তথা বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতিকে আশ্রয় দিতে কুন্ঠিত হননি। মহারাজ সীতারাম রায় যখন দেখলেন যেঁ সব হিন্দু নৃপতিদের ভরসা তিনি মুঘলকে খাজনা না দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁরা সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছে এবং তিনি আর স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবেন না তখন তিনি তাঁর পরিবারকে পাঠিয়ে দিলেন কোম্পানীর রাজত্বে। সীতারামের পরিবারকে বলা হয় কলকাতার প্রথম রাষ্টীয় শরনার্থী। তাঁদের আশ্রয় দিয়ে গোবিন্দপুরের রমানাথ পাটোয়ারী স্বাধীন চিত্ত বাঙালির মুখ রক্ষা করেছিলেন।

সেকালের গোবিন্দপুরের পাটোয়ার রমানাথ রায়ের সঙ্গে আরও যাদের নাম পাওয়া যায়, জারা গোবিন্দপুরের উন্নতিতে ইংরেজদের পাশে থেকে কাজকর্ম ক্রেছেন তাঁদের মধ্যে সকলেরই রক্তে ব্যবসা। তাঁরা বরানগরের তাঁতিদের দাদন দিয়ে কাপড় তৈরি করিয়ে বিদেশি বনিকদের সরবরাহ করতেন, তাই তাদেরকে বলা হত দাদনি বণিক। ১৭০৪ খ্রীঃ কম্পানীর পাঞ্জাবি ব্যবসায়ী দীপচাঁদ ভল্লাকে (ক্লাইভের বন্ধু উমিচাঁদের ভাই) কোম্পানি নিয়োগ করে দেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোম্পানীর হয়ে কাজ করার জন্য। হঠাৎ তিনি মারা গেলে সেই কাজটি পায় শেঠ জনার্দন। তিনি প্রচুর সম্পত্তি বানিয়েছিলেন। জনার্দন শেঠের আমলেই গোবিন্দপুরে শেঠেদের বাগান তৈরি হয়। তাঁর জ্যৈষ্ট পুত্র বৈষ্ণবচরনকে সেকালে ধনকুবের বলে

মান্য করতেন অনেকেই। বৈষ্ণবচরনের ট্রেডমার্কের এমনই সুখ্যাতি ছিল যেঁ গঙ্গাজলের ঘড়ার মুখে তাঁর শিলমোহর দেখলেই তা আদি ও অকৃত্তিম গঙ্গাজল বলে মানত। শেঠ বংশের রামকৃষ্ণ ও রাসবিহারী ইংরেজ টোলায় (এখনকার হেয়ার স্ট্রিট) বাড়ী বানিয়েছিলেন।

প্রাচীন কলকাতায় শেঠদের মত 'ভকিল'রা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। নবাবের দরবারে, সুবেদারদের সভায়, ফৌজদারের দুয়ারে এরা ইংরেজ কোম্পানির হয়ে ওকালতি করতেন। কোম্পানীর কাগজে ও নথিপত্রে যেঁ স বাঙালি উকিলদের কথা জানা যায় তাঁদের মধ্যে মল্লিক পরিবারের সন্তোষ মল্লিক ছিলেন খুবই উদ্যোগী পুরুষ।

সুতানুটি গোবিন্দপুর কলকাতার ত্রিবেনীসঙ্গমে যেঁ কলকাতার প্রবাহমানতা আজও অব্যাহত সেখানে সব চরিত্র হারিয়ে গেছে। গোবিন্দপুরও নেই, সেই ঘনজঙ্গল, মারকুটে ঠ্যাঙারে বাহিনী, শিয়ালের হুক্কা হুয়া। পাল্টে গেছে দৃশ্যপট। গোবিন্দপুরের সীমানার মধ্যেই জেগে উঠেছে ভবানীপুর।

ভবানীপুর নামটিও ইতিহাসের শতবর্ষ অতিক্রম করে গেছে। বাংলার ইতিহাসে ও কলকাতার ইতিহাসে ভবানীপুর অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঔপনিবেশিক কলকাতার মানচিত্রেও যে গোবিন্দপুরকে পাওয়া যায় তাঁর মধ্যেই ছিল ভবানীপুরের অবস্থান। বানভাঁসি আদি গঙ্গার জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় ভবানীপুর। শহরের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভবাণীপুরের বুক চিরে ছুটে চলল পাতাল রেল। স্টেশনটির নাম ভারত গৌরব বঙ্গসন্তান ভবানীপুরের বাসিন্দা সুভাষচন্দ্র বসুর নামে – নেতাজী ভবন। সেদিন ক্যালেন্ডারের পাতায় তারিখটি ছিল ১৯৮৬ র ২৯ এপ্রিল।

এই ভাবেই শহর কলকাতার ক্রমোন্নতির পাশাপাশি ভবানীপুরের উন্নতি সাধিত হয়ে চলেছে। অতি সম্প্রতিক কালের ভবানীপুরের রাজনৈতিক পালাবদলের ছবিটির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ভবানীপুরের উপনির্বাচনের ফলাফলে ভবানীপুরই উপহার দিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। আজ বাংলা কেন ভারতের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক দূতক্রিড়ার অনেক ইতিহাসই তৈরি হয়েছে ভবানীপুরের বুকে। ইতিহাস থেকে আরও ঐতিহাসিক হয়ে উঠল ভবানীপুরের ৩০-বি হরিশ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট বাড়ীটি, যার বাসিন্দা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। শুধু তাই নয় এর আগেও ভবানীপুর থেকে আমরা পেয়েছিলাম বাংলার আরেক মুখ্যমন্ত্রী- সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মহাশয়কে।

ভবানীপুরের ধর্মচর্চার দিকে আলোকপাত করলে সাহেব Willson এর কথাটির প্রুতিধ্বনি করে বলতে হয় "All roads goes to Kalighat" গোবিন্দপুর থেকে ভবানীপুরের ক্রমবিকাশে বারবার 'কালীঘাট' বা কালীক্ষেত্র কথাটি উঠে এসেছে। অন্যান্য ধর্মীয় অধিষ্ঠানেরও ভবানীপুরের মাটিতে শতাব্দীকাল উত্তীর্ন হয়েছে। একদিকে ব্রহ্মসমাজ, অন্যদিকে ভোলাগিরির আশ্রম, মিশনারীদের চার্চ যেমন

আছে, তেমনি আছে মন্দিরের পাশে মসজিদের অবস্থান, আছে শিখি সম্প্রদায়ের গুরুদ্বারা,আবার শতাব্দি প্রাচীন শীতলা মায়ের মন্দির। ভবানীপুরের বিকাশে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এসে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে বাংলার পরম্পরায় তারাই ভবানীপুরের অভিন্ন বাসিন্দা হয়ে গেছেন।

ভবানীপুরের পথঘাট

ভবানীপুর, কালীঘাট, চেতলা, খিদিরপুর এসব হবে তখন শহরের উপকন্ঠ। শহর বলতে বোঝাত লোয়ার সারকুলার রোড বিস্তৃত উত্তর দিকে- ওই উত্তরদিককেই তখন কলকাতা বলা হত।

চৌরঙ্গী থেকে ভবানীপুরের প্রবেশ পথের প্রথম রাস্তাটার নাম **এলগিন রোড।** এলগিন রোডের আগের নাম ছিল পিপুলপট্টি-কা-রাস্তা। তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন জেমস্ ব্রুশ এলগিন। তাঁর নামেই এই রাস্তা, এখন এই রাস্তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে লালা রাজপত রাই সরনি। পাঞ্জাব কেশরী লালা রাজপত রাই-এর শতবার্ষিকীপালনের দিনটিতে ২৪-০২-১৯৬৫ তাঁর সম্মানে রাস্তাটির নব-নামাঙ্কন করা হয়। তবে এলগিন রোড কিন্তু মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি।

এই রাস্তার উপরেই আছে অনেক বিশিষ্ট মানুষজনের বাড়ি যাদের নামের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতি জড়িয়ে আছে বাংলা ও ভারতের ইতিহাসের।

‘চার’ নং বাড়ীটই ছিল জোড়া সাঁকো ঠাকুরবাড়ির সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। রবীন্দ্র সাহিত্য শিল্প ও সংগীতের অন্যতম প্রবক্তা। ৫ ও ৬ নম্বর বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন রায় বাহাদুর গিরীশ প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। ৭ ও ৯ নম্বর বাড়িটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব জড়িয়ে আছে ভবানীপুরের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্টান হিসাবে। ‘Embevilla’, London Zenna House, London Mission Christian Girls’ Dey School, L.M.S Christian Boarding. ১১ ও ১২ নম্বর শম্ভুনাথ পন্ডিতের হাসপাতাল। বলা হত সাউথ সাবার্বান হসপিটাল।

উল্লেখ্য ৩১ নম্বরে ছিল মহম্মদ ওয়াদিজ হোসেন আকবরের ‘এলগিন আস্তাবল’। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত উৎসব বা বিবাহ দিতে অথবা দূর ভ্রমনে। ৩৮/১চিল সুঙ্গেরের রাজার বাড়ি আর ৩৮/২ রায় জানকীনাথবসু বাহাদুরের বাড়ি। জানকী নাথ বসুর পুত্রই সুভাষ চন্দ্র বসু, পরবর্তী কালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। ১৯৪১ সালে এই বাড়ি থেকেই তাঁর মহানিষ্ক্রমণ।

৪৩ নম্বরে ‘Bhowanipur Congregational Church’ , ৪৪ আর্মেনিয়ান ক্লাব, ৪৫ ও ৪৬ St Mary’s Church & St Mary’s Boys School. চার্চটি ১৮৮৮ সালে নির্মিত। আজকের এলগিন রোড বা লালা রাজপত রাই সরণির দু পাশের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটলেই চেহারা ও চরিত্রের দ্রুত পরিবর্তনে আধুনিক ফ্যাশনের শোরুম বা বুকস্টোর, পার্লার আর রেস্তোরার ভীড়ে সব হারিয়ে বা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। চোখ ধাঁধানো স্কাইস্ক্রাপারও দেখা যায়।

‘রানী শঙ্করী লেন’ আর একটি প্রাচীন রাস্তা। রাজা নৃসিংহ দেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী রানী শঙ্করী। রাজা নৃসিংহ বিখ্যাত হিংসেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্টাতা। ১৮০২ খ্রীঃ রাজার মৃত্যু হলে তাঁর প্রথমা স্ত্রী সতী

হয়েছিলেন। রানী শঙ্করী ১৮১৪ সালে রাজার নির্মিত হিংসেশ্বরী মন্দিরের নির্মাণের কাজটি সম্পূর্ণ করেন। বর্গীয় আক্রমনের সময় প্রজাদের তাঁর দুর্গের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ওই লেন বা গলিপথ দিয়ে এগোলেই ৩ নম্বর বাড়ির পরেই হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী রোড তারপর আবার ক্রমাগত এগিয়ে গিয়ে যুক্ত হয়েছে কালিদাস পতিতুন্ড লেনে। কালিদাস পতিতুন্ড লেনের নাম ১৯৫২ তে পরিবর্তন করে রাখা হয় পার্বতী চক্রবর্তী লেন।

দেবেন্দ্র ঘোষ রোড- রাস্তাটাই পূর্বে কাঁশারী পাড়া রোডের অংশ বিশেষ। ভবানীপুরের এই অঞ্চলটি শর কলকাতার মধ্যে ছিল না। ১৮৮৮ সালে এটি কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হয়। কাঁশারীপাড়া রোড এই অঞ্চলের প্রাচীন রাস্তা। ১৮৭২ সালে এটি কলকাতার বিলিওন সার্ভে ম্যাপ এই রাস্তাটির উল্লেখ আছে। সেসময় এখানে কাঁসারীরা বাস করত। নগরোন্নোয়নের চাপে তারাপরে ওই অঞ্চল ত্যাগ করে চলে যায়। শুধু থেকে গেল তাঁদের বাস করা রাস্তাটার নাম। তখন রাস্তাটি শম্ভুনাথ পন্ডিত স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে দক্ষিনে, পড়ে পূর্বদিকে ঘুরে বন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রিটের সংযোগ স্থলে মিশেছে। যেহেতু রাস্তাটি ছোট তাই এই নামের আগের অনুমোদন বাতিল করে ১৯২০ সালে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড নামে নামাঙ্কিত করে।

হেসাম রোড- এই রাস্তাটি জাস্টিশ দ্বারকানাথ রোড থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড ও রায় স্ট্রিটের সংযোগস্থলে এসে পড়েছে। ভবানীপুরের অন্তর্গত রামমোহন দত্ত রোডের অংশবিশেষ নিয়ে হেসাম রোড তৈরি হয়েছিল। সেই সময় রামমোহন দত্ত রোড এলগিন রোড থেকে বেড়িয়ে দক্ষিনের দিকে বিস্তার হয়ে কিছুটা পরে দক্ষিনপূর্ব দিকে বিস্তার হয়েছিল। এই রাস্তাটিই একটি উমানন্দ রোড ও নীচের আংশই হয় – হেসেন বা হেসাম রোড। ১৯১৮ সালের পৌর অধিবেশনের ৩০ অক্টোবর তারিখেই নামটি প্রস্তাব ও পাশ করা হয়।

হেসাম কে ছিলেন?- সেই অনুসন্ধানে যতদূর জানা যায় হেসাম সাহেব ছিলেন ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন কালেক্টর। ওই অঞ্চলে তিনি ছিলেন নারী শিক্ষা বিস্তারের কর্নধার এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এখানেই তিনি প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একইসঙ্গে বিদ্যালয় চালনা ও পরিচালনা করার সবরকম অর্থব্যয় নিজেই করতেন।

প্রতিষ্টান পরিচয়

যুগের প্রয়োজনেই প্রতিষ্টানের সৃষ্টি হয়েছিল ভবানীপুরে। শিক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি, সংগীত চর্চা কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, জনকল্যানমূলক সেবা প্রতিষ্টান, সঙ্ঘ, থিয়েটার, যাত্রাদল বা কালের বিবর্তনে ছবিঘর, প্রশাসনিক প্রতিষ্টান, এমনকি জাতি-ধর্ম-বর্ন-সম্প্রদায়ভিত্তিক মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, গুরুদ্বারা, বৌদ্ধসঙ্ঘ দ্বারা সাজানো ছিল ভবানিপুরের আর্থনৈতিক চালচিত্রটি। পুস্তক বিক্রেতা থেকে শুরু করে সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকার প্রকাশক সংস্থা এবং রসনা তৃপ্তির জন্য সুপ্রাচীন ময়রা দোকান থেকে শুরু করে হালফিলের রেঁস্তরা ও কফিশপ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে ভবানীপুরের বুকে। ভবানীপুরের গলি থেকে রাজপথে ছড়িয়ে থাকা এই সব প্রতিষ্টানেরনেকেই শতবর্ষ অতিক্রম করেছেন, কেউ বা শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে, কেউ বা অর্ধশতক অতিক্রান্ত করে ব্যবসা বানিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন যুগ প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে। ভবানীপুর প্রতিষ্টান সমূহকে সাধারনভাবে তিনটি ধারায় দেখতে পাওয়া যায় – শিক্ষামূলক প্রতিষ্টান, ধর্মীয় প্রতিষ্টান ও বিনোদনমূলক প্রতিষ্টান। জনশিক্ষার দিক থেকেও ভবানীপুর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভবানীপুরের ২৪ এ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ রোডে অবস্থিত ‘ভবানীপুর পাঠাগার’ হল এরকমই একটি গর্বের প্রতিষ্টান। ১৯৪৪ সালে ভবানীপুরের পুস্তকপ্রেমী মানুষের অকৃত্তিম ভালোবাসায় ও সংগ্রহে রূপনারায়ণ নন্দন লেনে প্রয়াত কানাইলাল নন্দী মহাশয়ের বাড়িতে তৈরি হয়েছিল ‘ তরুন শক্তি পাঠাগার’। এই পাঠাগারই দু’বার স্থান পরিবর্তন করে বর্তমানে ‘ ভবানীপুর পাঠাগার’ নাম নিয়ে ঐতিহ্যের প্রতিক হয়ে অবস্থান করছে। পাঠাগারের কর্মসূচী বিরাট এবং ব্যপক। এই কর্মকান্ডের সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ত্বের নাম। ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক বিভাগের সূচনা ও ফ্রি-রিডিং রুমের ব্যবস্থাপনার দ্বারা এক বিরাট প্রতিষ্টান রূপে ২০১৯ সালে ৭৫ বছর উৎযাপন করেছে ‘ভবানীপুর পাঠাগার’।

শিক্ষার আঙ্গিনায় সর্বপ্রথম যে প্রতিষ্টানটির নাম ভবাণীপুরের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্টান রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা হল সাউথ সাবার্বন স্কুল। এই স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তৎকালীন বঙ্গ সমাজের বহু নামজাদা ব্যক্তিত্ব। স্কুলের প্রতিষ্টাতা সমিতি থেকে পরিচালন সমিতি তথা ছাত্রও সম্প্রদায় সকল স্তরের মধ্যেই ছিল এদের অবাধ উপস্থিতি। ১৮৭৪ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভবানীপুরের মিডিল ইংলিশ স্কুল ও কালীঘাটের প্রাইমারী স্কুল একত্রিত হয়ে সাউথ সাবার্বন স্কুল গড়ে উঠেছিল। বেশ কয়েকবার বাড়ি বদল করার পর ১৮৯০ সালে হরিশ মুখার্জ্জী পার্কের কাছে গোপাল ব্যানার্জী রোডে পাকাপাকিভাবে স্কুলের ভবন নির্মিত হয়েছিল। সঠিক শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন ও বহু বহু নাম করা ব্যাক্তিত্বকে শিক্ষক ও ছাত্রও হিসাবে লাভ করে স্কুলের মর্যাদা, সুনাম ও পরিধি হয়ে উঠেছিল ব্যপক। ১৭ নং ল্যান্সডাউন রোডে ব্রিটিশ সরকারের অনুমতিক্রমে ১৯১৬-১৭ সালে প্রতিষ্টিত হয়েছিল ‘সাউথ সাবার্বন কলেজ’। পরে এই কলেজের উদ্যোগী প্রতিষ্টাতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর নামানুসারে এই কলেজের নাম হয় ‘

আশুতোষ কলেজ ভবানীপুর'। ১৮৭৪ সালে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রি মহাশয়। আর স্কুলের ছাত্র তালিকায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে যামিনীভূষন রায়, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কে ছিলেন না।

একইভাবে শতবর্ষ অতিক্রান্ত ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন ও শিক্ষাক্ষেত্রে গর্বের একটি স্থান অধিকার করে রেখেছে। বাংলার শিক্ষগুরু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নকে সত্যি করার জন্য ভবানীপুরের মিত্র পরিবারের বিশ্বেশ্বর মিত্র মহাশয় ১৩ নম্বর কাঁসারী পাড়া রোডে একটি ভাড়াবাড়ীতে ১৯০৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্টা করেছিলেন ' মিত্র ইনস্টিটিউশন'। স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ সতীশ চন্দ্র বসু।

আরও একটি বিদ্যালয়ের কথা না বললেই ভবানীপুরের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। সেই বিদ্যাপ্রতিষ্টানটি হল 'চক্রবেড়িয়া হাই স্কুল'। ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্টিত এই স্কুলটি কলকাতার প্রাচীনতম স্কুলের মধ্যে অন্যতম। এই স্কুলটি প্রতিষ্টা করেছিলেন ভবানীপুরের তদানীন্তন বাসিন্দা রায় বঙ্গের মিত্র পরিবার । যখন বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে শিক্ষাজগতে চলেছে আলোড়ন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চক্রবেড়িয়া সাউথ রোডে তিনটি চালাঘর তৈরি করিয়ে স্কুলকে স্থানান্তরিত করেন। পুত্র আশুতোষ ও প্রায় তিনবছর পাঠ গ্রহন করেছেন এই প্রতিষ্টানে। পরে স্যার আশুতোষ ও বিচারপতি রমেশ চন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে বকুলবাগান রোডে বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মিত হয়। স্কুলের দেড়শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত চক্রবানী'র পাতায় প্রাক্তন ছাত্র শ্রী সমরেন্দ্র কৃষ্ণ সরকার (১৯২৩-২৭ বর্ষ) উল্লেখ করেছিলেন "স্কুলটি ছিল M.E School" অর্থাৎ "Middle English School"। কৃতি ছাত্রদের তালিকায় ছিলেন নতসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, মহানায়ক উত্তম কুমার, ধনঞ্জয় বৈরাগী, শম্ভু মিত্র, প্রাক্তন মহানাগরিক বিজয় বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ।

আদিগঙ্গা তীরবর্তী যে গোবিন্দপুরে একসময় সতীপ্রথা ছিল জনপ্রিয়, বলরাম বসুঘাট যেখানে 'সতীঘাট' নামে সর্বাধিক পরিচিত। শুধু এই ঘাটেই নয় ভবানীপুরের আদিগঙ্গা তীরবর্তী প্রায় সিব ঘাটেই একসময় ছিল সতিদাহ প্রথার প্রাবল্য, সেই ভবানীপুরই পরবর্তীকালে দক্ষিন কলকাতাকে দেখিয়ে দিয়েছিল নারী শিক্ষার প্রগতি। ইউনাইটেড মিশনারী স্কুল, বেলতলা গার্লস হাইস্কুল ও গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল ছিল ঔপনিবেশিক ভারতে নারী শিক্ষার তিনটি স্তম্ভ স্বরূপ। বাংলায় নবজাগরনেরকালে লন্ডন মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে ১৮৩২ সালে দক্ষিন কলকাতার আলিপুরে প্রতিষ্টিত হয়, 'দ্য ক্রিশ্চিয়ান বোর্ডিং স্কুল'। এই স্কুলটিই ১৮৩৭ সালে স্থানান্তরিত হয় ভবানীপুরে মিঃ ক্যাম্বেলের বাড়িতে। আবার ১৯১৩ সালের ২৪ শে নভেম্বর ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুল ও ওয়েস্লিয়ন মিশন হাই স্কুল ও লন্ডন মিশনারী

স্কুলের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছিল ‘ইউনাইটেড মিশনারি গালর্স হাই স্কুল’। বহু প্রতিভাময়ী প্রধান শিক্ষিকা ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের কর্মকুশলতায় এগিয়ে চলছিল এই স্কুলের বহুধা বিস্তৃত কর্মপরিধি।

এমনই এক শতবর্ষ অতিক্রান্ত বিদ্যালয় হল ‘বেলতলা গার্লস হাইস্কুল’। দক্ষিন কলকাতার নারীশিক্ষা বিস্তারে যার অবদান অনস্বিকার্য। ১৯২০ সালের ২ রা জুলাই ভবানীপুরের বকুলতলা অঞ্চলের পাঁচ-ছটি বালিকাকে নিয়ে শ্রী অখিল বন্ধু গুহ মহাশয় বেলতলা রোডের ২ নম্বর বাড়ির একতলায় শুরু করেছিলেন স্কুলের কাজ। উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা যাতে শিক্ষার আলো লাভ করতে পারে। ১৯২০ সালে গঠিত বালিকা শিক্ষা সমিতি, যার সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সেই সমিতি এই স্কুল গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

১৯২০ সালে ভবানীপুরের বুকে গড়ে ওঠে আরও একটি ইতিহাস বিজড়িত বিদ্যালয় ‘গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল’। মহামতি গোখেলের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে শ্রীমতি সরলা রায়, অন্নদাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের বাড়িতে ৫/৬ টি মেয়েকে নিয়ে শুরু করেন একটি স্কুল নাম দেন ‘গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’। এই স্কুলটি কিছুদিনের মধ্যেই ২৬ নং ল্যান্সডাউন রোডের একটি বড় বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। শ্রীমতি সরলা রায় স্কুলে মেয়েদের সবরকম শিক্ষার সুবন্দোবস্ত গড়ে তুলেছিলেন। প্রধান শিক্ষয়ত্রী হিসাবে মিস ঘোষ যোগদান করেছিলেন, গান শেখাতেন গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসংগীত শেখাতেন সাহানা দেবী ও কনক দাস, চিত্রাঙ্কন শেখাতেন কুশল মুখোপাধ্যায়, প্রফেসর সন্দ্রে বেহালা শেখাতেন। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের আলাদা ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল। ভবানীপুর অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য প্রদেশের মানুষের শিক্ষার জন্য গড়ে ওঠে। ন্যাশনাল হাই স্কুল আদর্শ হিন্দি বিদ্যালয়, দেশবন্ধু শ্রমজীবি বিদ্যালয়, খালসা মডেল স্কুল খুবই উল্লেখযোগ্য । এছাড়া লন্ডন মিশনারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে শুরু করে মিত্র ইনস্টিটিউশন এর মতন সুপ্রাচীন বিদ্যায়তন ও এখানে বিরাজমান। শিক্ষার আনুষঙ্গিক অঙ্গ হিসাবে আছে ভবানীপুর বুক ব্যুরো, ছিল সিগনেট প্রকাশনা, কবিবুধিয়া প্রভৃতি।

বাংলার নবজাগরনের যুগে নবজাগরনের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্টিত ব্রহ্মসমাজ ছিল বাংলার ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের পুরোটা। পরবর্তীকালে এই ব্রহ্মসমাজেরই শাখা সমাজ প্রতিষ্টিত হয় ভবানীপুরের স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে। এরই ফলশ্রুতি ছিল ‘পদ্মপুকুর ব্রহ্মসমাজ’। শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত ‘History of Bramho Samaj’ গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১৮৫২ সালে বিচারপতি শম্ভুনাথ পন্ডিতের বাড়িতে এই সমাজ আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৫৩ সালে ৭১ নং পদ্মপুকুর রোডের ঠিকানায় সমাজ ভবনটি নির্মিত হয়। আদি ব্রহ্মসমাজের ধারাতেই এখানে নিয়মিত উপাসনা পরিচালিত হত। ২৪ শে জুন ছিল এই সমাজের ‘প্রতিষ্টা দিবস’। প্রতি বছর ঐ দিন পূর্ণাঙ্গ উপাসনার ব্যবস্থা করা হয়। পদ্মপুকুর ব্রহ্মসমাজের পাশাপাশি

আরো দুটি ব্রহ্মসমাজ গড়ে উঠেছিল – সাউথ সুবার্বান ব্রহ্মসমাজ(১৮৭৪) ও ভবানীপুর সম্মিলন ব্রহ্মসমাজ(১৮৯৭)।

ব্রহ্মসমাজের পাশাপাশি ভবানীপুরে আছে শতবর্ষ অতিক্রান্ত 'গদাধর আশ্রম'। 'কালীক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মঠ' শীর্ষক রচনাটি থেকে জানা যায় শ্রী রামকৃষ্ণের গৃহীশিষ্য বলরাম বসুর দৌহিত্রী ইন্দুবালার বিবাহ হয় ভবানীপুর নিবাসী যোগেশ চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। তাঁদের একমাত্র সন্তান গদাধর জন্মের কিছুকালের মধ্যেই লোকান্তরিত হন। পুত্রশোকে কাতর হয়ে তাঁরা নিজেদের বসতবাড়ীটি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেন ও 'গদাধর আশ্রম' নাম রাখার অনুরোধ জানান। ১৯২০ সালে ১৭ ই নভেম্বর কালীক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মঠ 'গদাধর আশ্রম'এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

ঔপনিবেশিক শাসনে ব্রিটিশ সরকার ধর্মপ্রচারে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীদের ধর্মাচরনের জন্য কলকাতা তথা বাংলায় চার্চ প্রতিষ্টার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

কলকাতার ভবানীপুরে ১৮৬৮ সালে লন্ডন মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে ৪৩ নং এলগিন রোডে (লালা রাজপৎ রায় সরণি) গড়ে উঠেছিল প্রোটেস্ট্যান্ট 'ভবানীপুর কনগ্রিগেশনাল চার্চ', যা কলকাতার প্রথম পর্যায়ের চার্চগুলির মধ্যে অন্যতম। ভবানীপুরের দ্বিতীয় চার্চটিও একইরকম ঐতিহ্যবাহী এবং প্রায় পাশের ঠিকানা অর্থাৎ ৪৫ এলগিন রোডে (লালা রাজপৎ রায় সরণি) প্রতিষ্টিত হয়। চার্চটি 'সেন্ট পলস্' চার্চ থেকে আলাদা হয়ে 'সেন্ট মেরিজ চার্চ' নামে ভবানীপুরে প্রতিষ্টিত হয়। এই গির্জার মধ্যে উপস্থিত আছে ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুল। অসাধারন সমস্ত তৈল চিত্র এই চার্চটির অমূল্য সম্পদ।

কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি ও বিনোদনের ইতিহাসে ভবানীপুর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাংলার সমৃদ্ধ সংস্কৃতির একটুকরো ছোয়া ছড়িয়ে আছে ভবানীপুরের গলি থেকে রাজপথে ভবানীপুরের সংস্কৃতি চর্চায় যে নামটি সামনে আসে তা হল, 'ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী'। ১৯০০ খ্রীঃ ভবানীপুরে বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্টিত হয়েছিল এই সম্মিলনী উদ্দেশ্য ছিল রাজা মহারাজার দরবার থেকে সঙ্গীতকে জনসাধারনের সামনে নিয়ে আসা। মূলতঃ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে বাঙালি সমাজে জনপ্রিয় করাও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। সম্মিলনীর প্রতিষ্টাতা ছিলেন যাদব চন্দ্র বসু। নতুন নতুন শিক্ষার্থীদের সঙ্গীতে তালিম দেওয়ার পাশাপাশি ভারতের সঙ্গীত জগতে নিজেদের প্রতিষ্টা করার তাগিদ প্রথম থেকেই সম্মিলনীর প্রতিষ্টাতাদের মধ্যে ছিল। এর ফর ছিল বিখ্যাত সমস্ত সঙ্গীতের আসর যা কলকাতার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। পন্ডিত বড়ে গোলাম আলী, জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, বিমল মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, অমিয়রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, মনিলাল নাগ প্রমুখ ভারত বিখ্যাত গায়ক ও বাদ্যকারদের সঙ্গীতের মুর্চ্ছনা নীরবে স্থির হয়ে আছে ভবানীপুর সঙ্গীত

সম্মিলনীর সভাগৃহে। কোনরকম সরকারি অনুদান ছাড়াই আজও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে অবিচল ভাবে কাজ করে চলেছে 'ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী'।

এই সময় রবীন্দ্র সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গিতকেও স্ব মহিমায় প্রকাশিত করতে যারা পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বিশুদ্ধ রবীন্দ্র সঙ্গীতকে জনমানসে প্রতিষ্টিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে (২২শে শ্রাবন, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) জোঁড়াসাকোর মহর্ষি ভবনে ইন্দিরা দেবি চৌধুরানীর উপস্থিতিতে অনুষ্টানিক ভাবে 'বৈতানিক' সঙ্গীত সংস্থা প্রতিষ্টিত হয়। পরবর্তী কালে ৪ নং এলগিন রোডের বাড়িটিই এই প্রতিষ্টানের স্থায়ী ঠিকানা হয়। সৌমেন্দ্রনাথ ছাড়াও প্রসাদ কুমার সেন, শ্রীমতী অমিয় ঠাকুর, শ্রীমতি অমিতা ঠাকুর এখানে নিয়মিত জ্ঞান শেখাতেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেই 'বৈতনিক' এ আসতেন গান শোনানোর জন্য।

খেলাধুলার জগতেও ভবানীপুর সর্বদা অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল। স্বাধীনতা লাভের চেতনায় যখন সারা দেশ উত্তাল তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শে ভবানীপুরের কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় স্থানীয় তরুণদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন 'তরুন সম্প্রদায়' নামক শরীরচর্চা কেন্দ্র। ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সদাশিব মিত্রের একান্ত চেষ্টায় 'তরুণ সম্প্রদায়' লাঠি খেলা, জিমনাস্টিক, তলোয়ার খেলা, ট্রাপিজের খেলা আয়ত্ত করেছিল। সে সময়ে একটা ট্রেন্ড ছিল খেলাধূলায় বিদেশী দলকে হারানোর অর্থ ভারতমাতার সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া। এই জয় ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সমান। ফলে ক্লাবের সভ্যগণ বক্সিংকে তাঁদের প্রধান খেলা হিসাবে গ্রহন করলেন। কারন বক্সিং ছিল তখনও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের করায়ও। দেবকুমার সেন, ফনি শূরের চেষ্টায় ১৯৪২ সালে, ভবানীপুরের ২১, রূপনারায়ন নন্দন লেনে তৈরি হল 'ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন'। ভারতীয় বক্সার শ্রদ্ধেয় শ্রী পরেশলাল রায়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে 'ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন' হয়ে ওঠে ভারতের অন্যতম বক্সিং কেন্দ্র। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 'সারাভারত বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের' আয়োজনও করা হত নিয়মিত। এই অ্যাসোসিয়েশনের কৃতিছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ঠাকুরদাস কুন্ডু, অশোক বোস, রমেশ মুখার্জ্জী, ভূষন দাস, ডি। নন্দন, কারাবেনু ব্যানার্জী (১৯৫৭ স্টেট চ্যাম্পিয়ন), অসীম হালদার, দেবাং তামাং, সত্যেন্দ্র পন্ডিত, মুকেশ পাসোয়ান প্রমুখ। স্বাধীনতার পর এতবছর অতিক্রান্ত হলেও 'ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন' এখন স্ব-মহিমায় শরীরচর্চা কেন্দ্ররূপে ভবানীপুরে অবস্থান করেছে।

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

ভবানীপুরে সৃষ্টি ও সংস্কৃতির ইতিহাস খুঁজতে গেলে বেড়িয়ে পরবে এক স্বর্নখনি । শিল্প, শিক্ষা, রাজনীতি, সাহিত্য, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, ব্যবসা বানিজ্য সর্বক্ষেত্রেই ভবানীপুর নিজেকে প্রতিষ্টিত করে এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রগতির কাহিনীমালায় কৃতী সন্তান সন্ততিদের যারা শুধু বাংলার নয় ভারত গৌরবের পতাকা বহন করে নিয়ে গেছে দেশ দেশান্তরে। এই কৃতি মানুষদের কথা যারা প্রকৃত অর্থে প্রাতঃস্মরণীয় তাঁদের জীবনী বৃত্তান্তের মধ্যেই ভবানীপুরকে খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁদের স্মৃতি কথামূলক আত্মজীবনী পাতায় পাতায়।ভবানীপুরের কৃতীদের জীবনালেখ্য লিখতে গেলে এলগিন রোডের বসু পরিবারের কৃতিত্ব নজরে আসে। জানকীনাথ বসু, সুভাষ চন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র বসুর পিতা কটকের প্রক্ষাত আইনজীবী ছিলেন। তাঁর স্কুল সহপাঠী ছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তিনি সরকারি প্লীডার হন। রায় বাহাদুর পদটি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন তিনি ১৯৩৪ সালের ২ রা ডিসেম্বর কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

জানকীনাথ বসুর মেজ ছেলে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। তিনি ভারতীয় ব্যারিস্টার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং INA কে সর্বতভাবে সাহায্য করেন। তিনি সুভাষচন্দ্র বসু চরিত্র গঠনে সাহায্য করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অন্যতম জনপ্রিয় সংগ্রামী নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু। ১৯১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরিক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন ভারত বিদ্বেষ প্রচারের জন্য কয়েকজন ছাত্র-অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে ওটেনকে প্রহার করেন। সুভাষ চন্দ্রকে কলেজ থেকে বহিস্কার করা হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ICS চাকরি প্রত্যাখান করেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ হরিপুরা কংগ্রেসে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ খ্রীঃ ত্রিপুরী কংগ্রেসে পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করে সভাপতি পদে পুনঃ নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ খ্রীঃ পদত্যাগ করে তিনি ফরোওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন। জার্মানিতে পৌছে তিনি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করে শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। রাসবিহারী বসুর আহবানে ১৯৪০খ্রীঃ ইউরোপ থেকে সমুদ্র পথে সাবমেরিন যোগে সিঙ্গাপুরে পৌছান সুভাষ চন্দ্র। ১৯৪৩ খ্রীঃ আনুষ্ঠানিকভাবে রাসবিহারী বসু দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব সুভাষ চন্দ্রের হাতে সমর্পণ করেন এবং তাকে নেতাজী আখ্যায় সংবর্ধিত করা হয়। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করেন শহীদ দ্বীপ ও স্বরাজ দ্বীপ। ক্রমশ সুভাষের দক্ষ নেতৃত্বে রেঙ্গুন থেকে অগ্রসর হয়ে ইংরেজ সেনা বাহিনীকে পরাস্ত করে ইম্ফল ও কহিমার পথে ১৯৪৪ খ্রীঃ দুটি ঘাঁটি দখল করে। নেতাজী রচিত বাংলা গ্রন্থ

‘তরুণের স্বপ্ন’ এবং ইংরেজীতে লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী ‘An Indian Pilgrim’ আজও শিহরণ তোলে।

ভবানীপুরের ইতিহাস রচনা করতে গেলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অবদান স্মরন করা উচিত। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সন্তান। কলকাতার বলঙ্গা লেনে জন্ম হলেও ভবানীপুরের মানচিত্রে তাঁর বাল্যশিক্ষা ও আমৃত্যু জীবনযাপন। তাঁর ছাত্র জীবন শুরু সাউথ সুবারবান স্কুলে। অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারন মেধাবী ছাত্র হিসাবে বিশেষ পরিচিতি ছিল। ১৯০৪ সালে হাই কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেন। ১৮৯৮ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ও ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত ব্যাবস্থাপক পরিষদের সদস্য ছিলেন। তবে তাঁর চিরস্থায়ী খ্যাতির আসন পাতা ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে। ১৮৮৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য হন। তিনি প্রথম মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসারের প্রস্তাবক.১৯০৬ থেকে ১৯১৪ খ্রীঃ চার টার্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। দেশবাসী তাকে ‘বাংলার বাঘ’ বলে সম্মানিত করেছেন। ২৫.০৫.১৯২৫ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর পর ভবানীপুরের রসা রোডের নাম পরিবর্তন করে তাঁর স্মৃতিতে আশুতোষ মুখার্জী রোড ও সাবারবান কলেজকে আশুতোষ কলেজ নামে নামাঙ্কিত করা হয়।

শিক্ষাগুরু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সন্তান ছিলেন রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৮৪ খ্রীঃ)। ১৯১৯ সালে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে ১৯৪৮ এ বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ১৯২০ সালে সেনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে ডিন অফ দ্যা ফ্যাকাল্টি নির্বাচিত হন। তিব্বতে চিনা অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিশনের তিনি জুরি হয়েছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১ – ১৯৫৩ খ্রীঃ) শিক্ষা জীবন থেকে কর্মজীবন অনেকটাই ছিল ভবানীপুর জুড়ে। ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে কৃষিশিক্ষা ব্যবস্থা বিহারীলাল মিত্রের অর্থে সোশাল সায়েন্স বিভাগ খোলা আশুতোষ মিউজিয়াম ও পাঠাগার স্থাপন ও বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রবর্তন তাঁর কৃতিত্ব। শিক্ষাজগত থেকে রাজনীতির আবর্তেই তাঁর অধিক পরিচিতি। রাজনীতি প্রবেশ করেন হিন্দু মহাসভার নেতারূপে। জনসংঘ নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন ও প্রতিষ্ঠা করেন। পার্লামেন্টে তিনি অসাধারণ বাগ্মী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতির প্রতিবাদে কাশ্মীর প্রবেশ করে তিনি বন্দী হন।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০২ – ১৯৯৭ খ্রীঃ) কলকাতার ভবানীপুরে জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা তিনি পর্বত প্রেমিক, অক্লান্ত পরিব্রাজক, ভ্রমন বিষয়ক অন্যতম শ্রেষ্ট কাহিনীকার, তিনি ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকার প্রকাশ করেন ভবানীপুরের বাড়ির ঠিকানা থেকেই। এই পত্রিকাতেই শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ উপন্যাস

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি ‘পঞ্চকেদার’, ‘হিমালয়ের পথে পথে’, ‘মনিমহেশ’, ‘শেরপাদের দেশে’, ‘তপোভূমি মায়াবতী’ প্রভুত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

ভবানীপুরের আর একটি বিখ্যাত পরিবার হল ভুবনমোহন দাসের পরিবার, ভুবন্মোহন দাস (১৮৪৪-১৯১৪ খ্রীঃ) অ্যাটর্নি ছিলেন। তিনি দেশপ্রেমী, সুলেখক এবং সমকালীন চিন্তক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ‘ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন’ ও ‘বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন’ এই দুটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শেষ জীবন তিনি পুরুলিয়ায় তিনি ধর্ম চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁরই পুত্র বাংলা তথা ভারত গৌরব চিত্তরঞ্জন দাস।

চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০ – ১৯২৫ খ্রীঃ) প্রথম শিক্ষালাভ করেন ভবানীপুর লন্ডন মিশনারি স্কুলে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করলেও বিলেতে ভারত সম্বন্ধে একটি তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা দেওয়ায় তাঁর নাম কাটা যায় ১৯৯৩ খ্রীঃ ব্যারিস্টার হয়ে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। অনুশীলন সমিতি বিপ্লবী দলের সাথে যোগাযোগ ছিল, যোগাযোগ ছিল শ্রী অরবিন্দ ঘোষ ও ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকার সঙ্গে। তিনি রাজনৈতিক মামলায় অংশগ্রহন করতেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী পক্ষের সমর্থনে ব্যারিস্টার ও দেশপ্রেমিক রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অসামান্য ত্যাগের জন্য বানলার মানুষ তাকে দেশবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। কংগ্রেস থেকে বেড়িয়ে এসে তিনি স্বরাজ দল গঠন করেন। মৃত্যর আগে পৈত্রিক বাড়ি জনসাধারণকে দান করেন। যেখানে আজ গড়ে উঠেছে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন। সুভাষ চন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভবানীপুরের বাসিন্দাদের জন্য একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বাসন্তী দেবী (১৮৮০-১৯৭৪ খ্রীঃ) চিত্তরঞ্জন দাসেও পত্নী ছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন এবং কারাবরণ করেন। ননদ উর্মিলা দেবী ও নারীকর্মী মন্দিরে সুনীতি দেবী সহ খাদি ঘাড়ে করে বড়বাজারে আইন অমান্য ও হরতাল ঘোষনা করে গ্রেফতার হন। বাংলা উত্তাল হয়ে পড়লে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। দেশবন্ধু গ্রেফতার হলে ‘বাংলার কথা’ পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন।

অপর্ণাদেবী (১৮৯৯ – ১৯৭৩ খ্রীঃ) চিত্তরঞ্জন দাসের কন্যা ছিলেন। ব্যারিস্টার সুধীর চন্দ্র রায়ের সাথে বিবাহ সুত্রে আবধ্য হন। এই বিয়ে হচ্ছে হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে প্রথম অসবর্ণ বিবাহ। বাংলা দেশের কীর্ত্তনের পুনরুজ্জীবনে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ‘দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন’ ও ‘কীর্ত্তন পদাবলী’ তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি রচনা।

হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১খ্রীঃ) কলকাতার ভবানীপুরের মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। ‘হিন্দু ইন্টেলিজেসার’ ও ‘দি বেঙ্গল রেকর্ডার’ পত্রিকার লেখনিতে সরকারের তীব্র সমালোচনা করতেন ১৮৫৩ খ্রীঃ হরিশ চন্দ্রের সম্পাদনায় ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ প্রথম প্রকাশিত হয়। নীলকর চাষীদের উপর

ইংরেজদের অকথ্য অত্যাচারের নগ্ন ছবি তিনি তাঁর বিদ্রোহী কলমে ফুটিয়ে তোলেন। নিজের খরচায় তিনি চাষীদের সপক্ষে মামলা করেন।

শম্ভুনাথ পন্ডিত (১৮২০ – ১৮৬৭ খ্রীঃ) ভবানীপুরে লক্ষ্ণৌ থেকে এসে ১৮৪১ খ্রী সদর দেওয়ানী কর্টের সহকারী রেকর্ডকিপার হন। তখনই আইনের নানা বিশয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৮৫৪ খ্রী ডিক্রি জারি মুহূরীর পদ পান, তখনই ডিক্রি জারি আইনের সমালোচনা করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৪৮ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফৌজদারি উকিল হন। শম্ভুনাথ পন্ডিত ভারতীয় বিচারপতি নিযুক্ত হন। কলকাতার ভবানীপুরে তাঁর স্মৃতিতে একটি রাস্তা আছে এবং একটি হাসপাতাল আছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭ -১৯১৯ খ্রীঃ)- ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৪ খ্রীঃ তিনি ‘সোমপ্রকাশ’ সম্পাদনা করেছেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ তিনি ভবানীপুরের সাউথ সাবারবান স্কুলে হেডমাস্টার পদে যোগদান করেন। এই সময় তিনি ভবানীপুরের বাসিন্দা হয়ে যান, তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা ‘রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে অনেক স্থানে ভবানীপুরের কথা পাওয়া যায়, এছাড়া ‘History of Brahmo Samaj’ তিনি ভবানীপুর সমাজের কথা বলেছেন।

অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬ খ্রীঃ) নোয়াখালি থেকে এসে কলকাতার ভবানীপুরে কাকার বাড়িতে থাকতেন। সাবারবান স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সাব জর্জ থেকে জেলা জর্জ হন। ‘পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ’ জীবনী তাকে লোকপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে আড্ডা দিতেন ভবানীপুর বুক ডিপো দোকানে।

অহিন্দ্র চৌধুরীর (১৮৯৫ - ১৯৭৪ খ্রীঃ) পরিচয় নটসূর্য হিসাবে কিছুদিন ভবানীপুরের লন্ডন মিশনারি স্কুলে পড়েছিলেন। ‘সাজাহান’ নাটকে সাজাহানের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সর্বকালের শ্রেষ্ট বলে নাট্য সমালোচকরা উল্লেখ করেছেন।

হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২০- ১৯৮৬ খ্রীঃ) কলকাতার ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন। ‘বাতায়ন’ ও ‘দেশ’ পত্রিকায় তাঁর ছোটগল্প প্রকাশিত হত। ১৯৩৫ খ্রী তিনি রেডিওতে তিনি গান করেন। ‘নিমাই সন্ন্যাস’ ছবি নেপথ্য গায়ক হিসাবে চলচ্চিত্রে আসা। তাঁর গাওয়া ‘রাণার’, ‘গাঁয়ের বধূ’, ‘পালকির গান’, ‘অবাক পৃথিবী’, ‘সূর্য ডোবার পালা’ অসংখ্য রবীন্দ্র সংগীত ও আধুনিক গান আজও স্মরনীয় হয়ে আছে। তিনি হিন্দি সুরের জগতেও অসংখ্য গান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

<u>গ্রন্থঋণ</u>

<u>BIBLIOGRAPHY</u>

1. A HISTORY OF BENGAL : BEFORE AND AFTER PLASSEY – LIVOCO SCRUFTON
2. SURVEY REPORTS OF 1772, 1720, 1755 – W.M FIRMINGER ON CALCUTTA AND NEIGHBOURING AREA
3. PLAN OF CALCUTTA WITH DEVELOPMENT PROGRAMME REDUCED FROM THE ORIGINAL ONE EXCECUTED AND BY LICUT. COL. M. WOOD
4. MEMOIR OF THE MAP OF HINDUSTAN – JAMES RENNEL
5. BENGAL OBITUARY – P.T NAIER

<u>গ্রন্থপঞ্জী</u>

১। কলকাতার দর্পণ – রাধারমণ মিত্র

২। কলকাতার একাল – সেকাল – হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

৩। কলিকাতা ষ্ট্রীট ডাইরেক্টোরি – ১৯১৫

৪। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান – ১ম ও ২য় খণ্ড

৫। আত্মজীবনী – শিবনাথ শাস্ত্রী

৬। কলিকাতার রাজপথ ঃ সমাজে ও সংস্কৃতিতে – অজিতকুমার বসু

৭। কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস – অতুল কৃষ্ণ রায়